প্রথম অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ও ঔপন্যাসিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব

এক.

ঔপন্যাসিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১লা অক্টোবর, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জেলার রাইনাদি গ্রামে। লেখক হিসেবে তাঁর আবির্ভাব বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, ভারতছাড়ো আন্দোলন, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা ও উদ্বাস্তু সমস্যা—এসবই চল্লিশের দশকের ঘটনা। লেখকের শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে ঐসব রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে। শুধু তাই নয়, যারা দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার প্রত্যক্ষ শিকার হয়েছিলেন লেখক নিজে তাঁদের একজন। শৈশবে যেমন তিনি নিস্তরঙ্গ পল্লি-জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি চোখের সামনেই সেই নিস্তরঙ্গ পল্লি-জীবনের উপর দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ ঝড়ও বয়ে যেতে দেখেছেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগ হয়ে গেলে কিশোর অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে জন্মভূমি পরিত্যাগ করে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে অস্থায়ীভাবে কিছুদিন বসবাসের পর তাঁরা বাসা বাঁধেন বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজারের নিকটবর্তী মণীন্দ্র কলোনিতে। উদ্বাস্তু পরিবারের সদস্য হিসেবে অর্ধাহারে বা অনাহারে তাঁর কৈশোর ও যৌবনের প্রথম দিকটি অতিবাহিত হয়।

রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার, মানুষের সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা, দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু মানুষের জীবনসংগ্রামের বিচিত্র রূপ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শৈশব ও কৈশোর জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন। উদ্বাস্তু পরিবারের সদস্য হওয়ায় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় কৈশোর ও যৌবনের প্রথমভাগে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কথা সাহিত্যিক বিমল কর তাঁর 'আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা' গ্রন্থে জানাচ্ছেন : ''অতীনের কাছে গল্প শুনেছি তার বাড়ি ছেড়ে পালানোর। তখন আর কতই বা বয়েস, উনিশ কুড়ি বড় জোর। বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে থাকতে পারেনি, আবার ফিরে এসেছে। খুঁজে বেড়িয়েছে আশ্রয় আর অন্ন সংস্থানের উপায়। হরেক রকমের অভিজ্ঞতা তার তখন, কখনও ধূপ বিক্রি, কখনও চায়ের স্টলে কাজ, কখনও কোন ব্যান্ডেজের কাপড় তৈরী করা, তাঁতীদের সঙ্গে তাঁত চালানো। এই করেই জীবন চলতে লাগল; তারপর খানিকটা আচমকা, বরাত জোরে ঢুকে গেল কিসের এক জাহাজী

ট্রেনিংয়ে। সেখান থেকে চড়ল জাহাজে, জলে ভাসল। কোলবয়ের চাকরি, মানে যাকে সোজা বাংলায় বলে—বেলচা করে কয়লা বোঝাইয়ের কাজ। এই জাহাজ অতীনকে গোটা না হোক অর্ধেক পৃথিবী ঘুরিয়েছে। ... এক সময় স্কুল মাস্টারি করত। তার ট্রেনিং ছিল শিক্ষকতার। মাস্টারি ছেড়ে চলে এলো কলকাতায়। কারখানার ম্যানেজারগিরির কাজ।''[১] অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো পেশাতেই সুস্থির হতে পারেননি। কারখানার ম্যানেজারগিরির কাজ থেকেও তিনি একসময় অব্যহতি নিয়েছিলেন। এরপর তিনি সাংবাদিকতার কাজ করতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি লেখালেখিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন।

প্রথম উপন্যাস 'সমুদ্র মানুষ' (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ) সমুদ্র ও নাবিক জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত। দ্বিতীয় উপন্যাস 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-তে লেখক দাঙ্গা ও দেশভাগের প্রেক্ষাপট ব্যবহার করেছেন। লেখকের প্রথম উপন্যাস থেকেই একদিকে যেমন অজানা দ্বীপ, সমুদ্র ও অচেনা বন্দরের এক নতুন ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট বাংলা উপন্যাসে জায়গা পায়, তেমনি সেই ভৌগোলিক পরিবেশে দেশ-মাটির সম্পর্কচ্যুত বাঙালি নাবিকের সুখ-দুঃখ ও জীবন-যন্ত্রণার এক মর্মন্তুদ কাহিনি শোনা যায়। লেখকের দ্বিতীয় উপন্যাসে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের বাঙালি জীবনের পরিবর্তনের রূপরেখাটি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। দাঙ্গার সূত্রপাত থেকে দেশভাগ ও দেশভাগ পরবর্তী সময়ের উদ্বাস্তু মানুষের নতুনতর জীবন সংগ্রামের সংকেত দিয়ে উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘটে। এরপর ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ইংরেজী ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় নাবিক-জীবন সম্পর্কিত উপন্যাস 'অলৌকিক জলযান'। পরের বৎসরই (১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয় উদ্বাস্তু মানুষের জীবন সংগ্রামের অনন্য আলেখ্য 'মানুষের ঘরবাড়ি'।

সুতরাং লেখকের একের পর এক প্রকাশিত উপন্যাসে সমুদ্র ও নাবিক-জীবন, দাঙ্গা ও দেশভাগ এবং উদ্বাস্তু মানুষের জীবন সম্পর্কিত কাহিনি অঙ্কিত হতে থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বাংলা উপন্যাসে পঞ্চাশ-ষাট বা সত্তরের দশকে দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা-সম্বলিত যে উপন্যাসগুলি রচিত হয়, তার প্রেক্ষাপট এই বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকই। আবার যাঁদের রচনায় এই বিষয়গুলি উঠে আসে তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই চল্লিশের দশকের এই উত্তাল সময়টিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ঔপন্যাসিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময়টিকে নিবিড়ভাবে অতিক্রম করেছেন, তা আমরা আগেই বলেছি। তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত লেখনী ধারণের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। লেখকের স্বীকারোক্তিতেই তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে : ''না লিখে আমার উপায় ছিল না। অস্তিত্বের সংকট থেকে লিখি। জন্মেছি, বড়ো হয়েছি, জীবনের

নানা সংঘাতে নিজেই জর্জরিত, দেশভাগ থেকে দাঙ্গা, যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ এবং সমাজের শোষণ আমাকে পীড়া দেয়। আমার অস্তিত্ব নাড়া খায়, না লিখে পারি না। কিছুটা প্রতিবাদের মতো আমি আমার অনুভূতিমালা সমূহ লেখায় ধরে রাখার চেষ্টা করি। দেশভাগ আমাকে ছিন্নমূল করেছে। এক জীবনে কত অভিজ্ঞতা! সমুদ্রে ঘুরে বেড়িয়েছি সাধারণ জাহাজী হয়ে। ট্রাক ক্লিনার ছিলাম একটা গ্যারেজে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাও আছে। তারপর কোনো স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সব ছেড়ে কলকাতায় কারখানার ম্যানেজার, তারপর সাংবাদিকতা, নানা পেশায় নানা মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আমার লেখার বিষয় — একটা সমাজকে ধরে রাখা। এইসব অভিজ্ঞতা এমন উৎপীড়ণে ফেলে দেয় যে আমি না লিখে পারি না।"[২]

লেখকের এই স্বীকারোক্তি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, চল্লিশের দশকের বাংলা ও বাঙালি জীবনে যে প্রবল ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ঘূর্ণাবর্তের প্রত্যক্ষ শিকার লেখক নিজেই। তাঁর সেই ব্যাপক ও গভীর জীবন-অভিজ্ঞতাই তাঁকে সৃষ্টিশীল লেখকে পরিণত করেছিল। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উপন্যাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, দাঙ্গা দেশভাগ উদ্বাস্তু সমস্যা বা স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের নানাবিধ রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক বিবর্তনের প্রতিক্রিয়া তাঁর উপন্যাসে ধরা পড়েছে। ধর্মের নামে দেশবিভাজন এবং দেশভাগ জাত সেই স্বাধীনতার মূল্য পরবর্তী কয়েক দশক ধরে এই উপমহাদেশের মানুষকে দিতে হয়েছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরও সামাজিক শোষণ বা রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচারের হাত থেকে ভারতবাসীর যথার্থ মুক্তি ঘটেনি। এর ভিত্তিভূমি তৈরি হয়েছিল নিঃসন্দেহে বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে। বাংলা ও বাঙালি জীবনে চল্লিশের দশকে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়া তৎক্ষণাৎ বাংলা কথা সাহিত্যে খুব বেশি ধরা না পড়লেও পঞ্চাশ-ষাটের দশকে যারা বাংলা উপন্যাসে কলম ধরেছিলেন, তাঁদের রচনায় সেই উত্তাল সময়ের প্রেক্ষাপটই মূলত প্রযুক্ত হয়েছিল। এজন্য পঞ্চাশের দশকে যে সকল কথা সাহিত্যিকের আবির্ভাব এবং ষাট বা সত্তরের দশকে যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁদের সৃজনক্রিয়া বুঝতে হলে বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পটভূমিটিকে সম্যকভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

দুই.

বাংলা উপন্যাসের ধারা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে

যে বৈচিত্র্যময় রূপান্তর দেখা দিয়েছিল তার পটভূমি রচিত হয়েছিল বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে। বহির্বিশ্বের সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ঔপনিবেশিক ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সংঘাতে এই এক দশকেই বাংলা ও বাঙালি জীবনের আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। এই এক দশকের রাজনৈতিক ঘটনাগুলি বাঙালির আর্থিক ও সামাজিক জীবনের মৌল রূপান্তর ঘটিয়েছিল। স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জীবনের আর্থসামাজিক রূপান্তরের জন্য চল্লিশের দশকের যে রাজনৈতিক ঘটনাগুলির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি সেগুলি প্রধানত:

(ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯ - ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ)।

(খ) মুসলিম লীগের 'লাহোর প্রস্তাব' (১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ)।

(গ) নেতাজীর অন্তর্ধান (১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ)।

(ঘ) ভারতছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ)।

(ঙ) গান্ধিজির কারাবরণ (১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ)।

(চ) কলকাতাসহ উত্তর পূর্ব ভারতে জাপানি আক্রমণের ত্রাস (১৯৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দ)।

(ছ) নিম্নবঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মন্বন্তর (১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ)।

(জ) গণআন্দোলন এবং কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা (১৯৪৩ - ৪৮ খ্রিস্টাব্দ)।

(ঝ) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ)।

(ঞ) দেশভাগ ও স্বাধীনতা (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)।

(ট) উদ্বাস্তু সমস্যা (১৯৪৭ - ৫০ খ্রিস্টাব্দ)।

চল্লিশের দশকে এইসব রাজনৈতিক ঘটনার কারণে স্বাধীনতা-উত্তর এ বঙ্গের অধিবাসীরা এক নতুন আর্থসামাজিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। ঐসব পরস্পর-সম্পর্কিত ঘটনাবলী এক দশকের মধ্যে বাংলা ও বাঙালি জাতিকে যে নতুন আর্থসামাজিক পরিস্থিতির সম্মুখীন করে তোলে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে তারই প্রতিফলন দেখা যায়।

চল্লিশের দশকের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ঘটনা হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে যার সূচনা হয়েছিল। এই বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। যুদ্ধের এই সময়কালের মধ্যেই ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির এক আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। আর তারই সূত্র ধরে বাংলার আর্থসামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসকরা সুকৌশলে ভারতীয় উপনিবেশকেও বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে নেয়। শেষ পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধের জঠরেই

ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যলিপি তৈরি হয়ে যায়।

ব্রিটেন বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ফলে তৎকালীন ভারতের ভাইসরয় লিন্‌লিথগো ভারতকেও এই যুদ্ধের অংশীদার হিসাবে ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে তিনি ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন। ভারতবর্ষকে বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়াতে কমিউনিস্ট পার্টি 'না এক ভাই, না এক পাই' নীতি গ্রহণ করে। এমনিতেই কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিষিদ্ধ ছিল। এবারে লর্ড লিন্‌লিথগো তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে 'ভারতরক্ষা আইন' বলে কমিউনিস্টদের ব্যাপকভাবে 'ধরপাকড়' শুরু করে দেন।

বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক পর্বেই ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সমীকরণ পুরোপুরি বদলে যায়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দেই নেতাজী সুভাষ বোস কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস ওয়ার্ধা কমিটির বৈঠকে নেতাজী বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনি সেখানে স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে, বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশকে সহযোগিতা না করে বরং ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন তীব্র করে তোলাই একান্ত জরুরি। কিন্তু গান্ধিজি প্রমুখ কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাগণ বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিতে ব্রিটেনকে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নেন। এই পরিস্থিতিতে আমজনতার সমর্থন নেতাজী সুভাষের দিকেই বেশি করে আসতে থাকে। তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী নেতা হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এ ব্যাপারে কমিউনিস্টরাও তাকে সমর্থন জানায়। ফলে সুভাষ বোসকে বারে বারে জেলে যেতে হয়। শেষ পর্যন্ত শারীরিক অসুস্থতার কারণে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কলকাতার এলগিন রোডের বাড়িতে গৃহবন্দি করে রাখে। যুদ্ধে ব্যস্ত ব্রিটিশ শক্তিকে এই সময়ে মোক্ষম আঘাত হানা প্রয়োজন মনে করে অবশেষে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি নেতাজী গৃহবন্দি অবস্থা থেকে সুকৌশলে অন্তর্ধান করেন। এরপর তিনি ছদ্মবেশে কাবুল মস্কো হয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী জার্মানিতে পৌঁছান। বার্লিন থেকে তাঁর বেতার-বার্তা শুনে দেশবাসী সেদিন হতচকিত হয়েছিল। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি জাপানে পৌঁছান এবং সেখানে জাপানের হাতে বন্দি ভারতীয়দের নিয়ে তিনি 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' গড়ে তোলেন। সাময়িকভাবে হলেও এই বাহিনী ব্রিটিশ শাসকদের চোখের ঘুম কেড়ে নিতে সমর্থ হয়েছিল।

নেতাজীর দেশত্যাগ ও ব্রিটিশ-বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মেলানোয় দেশের আমজনতার সমর্থন ও সহানুভূতি স্বাভাবিকভাবেই ফরওয়ার্ড ব্লকের দিকে যেতে শুরু করে। জনসমর্থন হারানোর ভয়েই কংগ্রেস ১৯৪২ সালে আচমকা 'ভারতছাড়ো' আন্দোলন শুরু করে। ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলনকে শক্ত হাতে দমন করতে উদ্যোগী হয়। ৯ই আগস্ট গান্ধিজি প্রমুখ

কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারা কারারুদ্ধ হন এবং যুদ্ধের শেষ তিনটি বছর তাঁরা কারান্তরালেই থেকে যান। গান্ধি, প্যাটেল, নেহরু, মৌলানা আজাদ প্রমুখ প্রথম সারির নেতারা কারাবরণ করলে সারা দেশের কৃষক শ্রমিকের মধ্যে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। অচিরেই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। ইংরেজ সরকার এই আন্দোলনকে কঠোরভাবে দমন করতে সমর্থ হয়েছিল। এর অন্যতম কারণ কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারা তখন সকলেই কারারুদ্ধ। আন্দোলনকে সঠিক দিক নির্দেশ করার মতো কোনো যোগ্য নেতৃত্ব তখন আর জেলের বাইরে ছিল না। কারাবরণের পূর্বে নেতারা ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কোনো কর্মসূচি স্থির করে রাখেননি। অন্যদিকে এই আন্দোলনকে বে-আইনি ঘোষণা করে আন্দোলন দমনের নামে ব্রিটিশ শাসকরা চন্ডমূর্তি ধারণ করেন। তাই আগস্ট আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

পক্ষান্তরে, আগস্ট আন্দোলনে প্রকৃত লাভ হয়েছিল মুসলিম লীগের। মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানের দাবি স্পষ্টভাবে ছিল না। উক্ত লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম লীগ শুধু মুসলমানদের জন্য পৃথক প্রদেশ দাবি করেছিল।[৩] গান্ধিজি প্রমুখ নেতারা মুসলিম লীগের এই দাবির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। ঐ বছরই (১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ, এপ্রিল) মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী রাজা গোপালাচারী বিধানসভায় এমন প্রস্তাব পাশ করেন যে, তা পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নেওয়ার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট আন্দোলনে কংগ্রেসী নেতাদের কারাবরণে লাভের ফসল ঘরে তুলেছিল মুসলিম লীগ। যুদ্ধে ব্যস্ত ব্রিটিশ সরকার এই সময়ে ঘৃণ্য বিভেদ নীতি গ্রহণ করে। এই সময় থেকেই ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগ ও আলি জিন্নাহ্-কে রাজনৈতিক মর্যাদা দিতে শুরু করেছিল। এই সময়ে ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছিল।

বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিধির মধ্যেই আগস্ট আন্দোলন, নিম্নবঙ্গে প্লাবন, মন্বন্তর প্রভৃতি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। যুদ্ধের সময়কালের ঐসব ঘটনা পরস্পর নিরপেক্ষ মোটেই নয়। বিশ্বযুদ্ধের এই সময়টিতে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল, সেই পরস্পর-সম্পর্কিত ঘটনাগুলির মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যায়। অন্যদিকে এই আগস্ট আন্দোলনে নিম্নবঙ্গের কৃষকরা সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করায় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে নিম্নবঙ্গে বন্যার পূর্বাভাস প্রশাসনের তরফ থেকে আগাম জানানো হয়নি। ফলে, সে বৎসর চাষিদের আমন আবাদ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই পরের বৎসর শুরু হয় মন্বন্তর (১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ)। ১৯৪৩-এর এই মন্বন্তর শুধু এক বৎসরের আমন

আবাদ নষ্ট হওয়ার জন্য হয়নি। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দেই ব্রহ্মদেশ জাপানিদের দখলে চলে যায়। ফলে সেখান থেকে চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। উপরন্তু ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের জন্য ঐসব এলাকা থেকে চাল সংগ্রহে নেমে পড়ে। ফলে, অচিরেই খাদ্যসংকট দেখা দেয় আর সেই সঙ্গে বাংলার গবর্নর ছোটলাট আর্থার হার্বাট তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক্‌কে গবর্নমেন্ট হাউসে ডেকে জোর করেই পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। ফজলুল হক-এর পূর্বে মুসলিম লীগে যুক্ত হলেও তিনি ছিলেন অনেকটাই উদার মনোভাবাপন্ন। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির পক্ষেই তিনি বরাবর ছিলেন। এর কিছুদিন পর ছোটলাটের উদ্যোগে স্যার নিজামুদ্দিনের নেতৃত্বে আবার বাংলার মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এর ফলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত শক্ত হয়ে যায়। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে যখন বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করছিল, সেই সময় বাংলার গবর্নর বিভেদের রাজনীতি কায়েম করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হয়েছিল।

এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিধির মধ্যে আগস্ট আন্দোলন, ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতি ও মন্বন্তরের জঠরে মুসলিম লীগ হালে পানি পেয়ে যায়। ক্রমশ মুসলিম লীগ সমগ্র বাংলায় পাকিস্তানের দাবির পক্ষে সোচ্চার হওয়ার সুযোগ পায়। ব্রিটিশ সরকার সুকৌশলে বাঙালির জাতিসত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করার সুযোগ পায়। বাংলা ভাগের সম্ভাবনা এই সময় থেকেই সুস্পষ্ট হতে থাকে। সুদীর্ঘকাল পারস্পরিক সহাবস্থানে থাকলেও এই সময় থেকেই বাংলার হিন্দু মুসলমান পরস্পরের প্রতি সন্দিহান হয়ে ওঠে। এই সন্দেহ আর প্ররোচনা মিলিত হয়ে বাংলায় দাঙ্গার পটভূমি রচিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এবং বহির্বিশ্বের উত্তাল রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এদেশ থেকে ব্রিটিশ সরকারের বিদায়ের ঘণ্টা বেজে যায়। বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ব্রিটিশ সরকার কতকটা স্বীয় বলহীনতা আর কিছুটা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে ভারত থেকে শাসন ক্ষমতা তুলে নিতে প্রায় বাধ্য হয়েছিল। এছাড়া ভারতবর্ষময় গণআন্দোলন ও গণবিক্ষোভে তাদের শাসন যন্ত্রও অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ক্লিমেন্ট এটলি ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন ১৯৪৮ এর জুন মাসের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পিছনে অনেক রাজনৈতিক সমীকরণ কাজ করেছিল। অবশ্য এর আগে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেই ভাইসরয় ওয়াভেল ক্ষমতা হস্তান্তরের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেই উদ্দেশে ১৯৪৫-এর মার্চে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এসেছিল।

কিন্তু কংগ্রেস ও লীগের অনড় মনোভাবের ফলে ক্যাবিনেট মিশন ব্যর্থ হয় ও ভারত বিভাগের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হয়।

ক্যাবিনেট মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর মুসলিম লীগ তাদের দাবি আদায়ের জন্য আরো বেশি সোচ্চার হয়। সেই উদ্দেশ্যে তারা ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করে। কলকাতায় সংঘটিত হয় এক বিরাট সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড। হিন্দুরাও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামে। দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালি, উত্তরপ্রদেশের গড়মুক্তেশ্বরেও। ব্রিটিশ সরকার প্রায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। এই পরিস্থিতিতেই এটলি ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন।

আপাতদৃষ্টিতে ভারত বিভাগের পশ্চাৎপট হিসেবে ভারতের অভ্যন্তরীণ দাঙ্গা-কলহকে দায়ি করা হলেও Transfer of Power Documents এর ভিত্তিতে মনে করা হয় : "ভারত সাম্রাজ্য বিসর্জন দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত বিভাগ ও ব্রিটিশ নীতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। ক্রীপস্ মিশনে আমরা দেখি, এই ব্রিটিশ নীতির অকাল বোধন, ক্যাবিনেট মিশনে তার পূজারতি ও মাউন্টব্যাটন মিশনে তার পূর্ণাভিষেক।"[৪]

বস্তুত ভারত ভাগের জন্য মাউন্টব্যাটন ভারতে পদার্পণ করেছিলেন। এটলি ১৯৪৭-এর ২০শে ফেব্রুয়ারি ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। তখনও হস্তান্তরের দিনক্ষণ ধার্য হয়নি। ঐ বছরই ২৪শে মার্চ মাউন্টব্যাটন ভারতে আসেন এবং ৩রা জুন দেশভাগের কথা ঘোষণা করেন। এভাবে ১৫ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনক্ষণ স্থির হয়ে যায়। ৮ই জুলাই ইংলন্ড থেকে আইনবিদ সিরিল র‍্যাড্‌ক্লিফ ভারতে আসেন সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যান হয়ে। তিনি মাউন্টব্যাটনের কাছে এই কাজের জন্য মাত্র পাঁচ সপ্তাহ সময় পেয়েছিলেন। এই সময় জওহরলাল নেহরু ও মহ: আলি জিন্নাহ্ জানিয়েছিলেন দেশভাগ আরো ত্বরান্বিত হলে ভালো হয়।[৫]

মাউন্ট ব্যাটেন, জওহরলাল ও আলি জিন্নাহ্ তৎপরতায় ১৫ই আগস্ট মধ্যরাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। বাংলা ও পাঞ্জাবের উপর দিয়ে এই ক'দিন রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হয়েছিল। পাঞ্জাবের দুদিকে এই ক'দিন শুধু মৃতদেহ নিয়ে ট্রেনগুলি পারাপার করেছিল। বাংলা সীমান্ত দিয়ে লক্ষ লক্ষ নরনারী বৃদ্ধ ও শিশু উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে এবং সামান্য সংখ্যক মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষ পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে বা পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়। ব্রিটিশ নীতির দূরভিসন্ধি ও কংগ্রেস লীগের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে দেশের দু-প্রান্তের দুটি জাতি তাদের জাতিসত্তা হারিয়ে খণ্ডিত এবং রক্তাক্ত স্বাধীনতা পেল।

চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। আর এই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্য দিয়ে বাংলার জনবন্টন এবং আর্থসামাজিক জীবনের কিছু মৌল পরিবর্তন সাধিত হয়, যা স্বাধীনতা উত্তর বাঙালির সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারাকে বিচিত্র খাতে বাহিত করেছে।

বিশ্বযুদ্ধের বাজারে যুদ্ধের রসদ সংগ্রহের জন্য এক নতুন শ্রেণির মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল। এরা হলেন মজুতদার। যুদ্ধে বাজারে এই শ্রেণির মানুষ খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ ও সরবরাহ করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে থাকে। "৪২শে'র মাঝামাঝি থেকে '৪৫ এর শেষ পর্যন্ত — এই যে আড়াই বছর যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ কৃষকের জীবনে যে দুর্যোগ নিয়ে এল, যে তোলপাড় ঘটাল — তা তো আমরা আগে কখনও দেখিনি! এই যুদ্ধের জঠরেই জন্ম নিল এক নতুন শ্রেণী — মজুতদার। কালোবাজারী শব্দটাও বোধহয় এই প্রথম যোগ হল বাংলা অভিধানে। গ্রামের চাষী লক্ষ করল তাদের খাদ্য গিয়ে জমা হচ্ছে মজুতদারের গুদামে — আর, তারা দিনের পর দিন না খেয়ে থাকছে।"[৬]

যুদ্ধের বাজারে এইসব মজুতদার, ব্যবসাদার এতটাই প্রতিপত্তি অর্জন করে যে, কলকাতার ঐ হিন্দু ব্যবসাদাররা ব্যবসার ক্ষেত্রে হিন্দু আধিপত্য বজায় রাখার জন্য দাঙ্গা ও দেশভাগের ইন্ধন জুগিয়ে যায়। দাঙ্গার সমকালে একদিকে রাজনৈতিক দলগুলির চাপ অন্যদিকে তেমনি ছিল হিন্দু ব্যবসাদারদের ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা। "বিদায়ি ব্রিটিশ পুঁজির সবটাই দখল করতে চেয়েছিল হিন্দু-পার্শি পুঁজিপতিরা — মুসলমান ব্যবসাদারদের সঙ্গে কোনোরকম প্রতিযোগিতায় যেতে তারা রাজি ছিল না। ক্যাবিনেট মিশন নিয়ে বিতর্কের সময়েই (মে, ১৯৪৬) জি. ডি. বিড়লার মনে হয়েছিল, দেশভাগ শুধু অনিবার্য নয়, সমস্যা থেকে উত্তরণের 'উত্তম পন্থা'।"[৭]

যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ কবলিত বাংলায় সেই সময় থেকেই মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার বিপুল পরিবর্তন ঘটে : "দুর্ভিক্ষের সময় আর্থিকভাবে বিপন্ন হওয়ায় বহু পরিবার সামাজিক মর্যাদা হারায়। বহু উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে নেমে যায়। ৭ লক্ষ পরিবারের ৩৮ লক্ষ মানুষ এই অবস্থা মেনে নেয়। কৃষিজীবী, কৃষি শ্রমিক, গ্রামের সাধারণ শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।"[৮]

সমাজে দুর্ভিক্ষ পীড়িত নারীর অবস্থা আরও বেশি সংকটময় হয়ে উঠেছিল : "দুর্ভিক্ষের বিপাকে পেটের দায়ে পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল বহু নারী। তাদের অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়। কেউ স্বেচ্ছায়, কেউবা অজ্ঞাতসারে। দুর্ভিক্ষ শেষে তাদের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেওয়া,

ব্যাপক সমস্যার আকার নেয়।" [৯] সেই সময়ে যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার সামাজিক স্থিতি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছিল : "চোরা কারবার আর দুর্নীতিতে দেশটা ছেয়ে যায়। এক নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল, যারা যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে পড়তে থাকে। যে মধুর সম্পর্ক ছিল এক একটি পরিবারে, সেখানে প্রাধান্য পেল 'আগে তো নিজে বাঁচি'।" [১০]

দেশভাগ ও স্বাধীনতার হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে ওঠে উদ্বাস্তু সমস্যা। লক্ষ লক্ষ ভিটেমাটি হারা উদ্বাস্তু মানুষের চাপে স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে জনগোষ্ঠীর নতুন স্তরবিন্যাস ঘটে। উদ্বাস্তু মানুষের চাপে কলকাতা মহানগরী সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এক হাহাকারময় অবস্থার সৃষ্টি হয়। দেশভাগ ও দাঙ্গার ফলে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবার তাদের মানসম্ভ্রম বাঁচাতে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে ত্রিপুরা, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। ধর্ম ও সম্ভ্রম বাঁচাতে এই সকল মানুষ যখন ভারতের সীমান্ত-সংলগ্ন প্রদেশগুলিতে আশ্রয় নেয়, তখন তারা কিন্তু স্থানীয় মানুষগুলির কৃপার পাত্র হয়ে পড়ে। রাতারাতি ভিটেমাটি ছেড়ে আসা মানুষগুলি এইসব উপেক্ষিত এবং অনাহুত মানুষ ক্যাম্পে কলোনিতে, মহানগরীর ফুটপাতে অথবা মনুষ্য বসতিহীন জঙ্গলময় জায়গায় আশ্রয় খুঁজতে থাকে। এইসব উদ্বাস্তু মানুষের জন্য সরকারি সাহায্য ছিল শুধু হিসেবের খাতায়, প্রকৃতপক্ষে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ব্যবস্থা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য।

দেশভাগের সময়ে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত একান্নবর্তী পরিবারগুলি এদেশ আর সংযুক্ত হবার অবকাশ পায়নি। স্ব স্ব প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত অন্নহীন গৃহহীন মানুষ পারিবারিক বন্ধনের অতীত স্মৃতি স্বাভাবিক ভাবেই ভুলে যায়। ফলে তাদের জীবনে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অক্ষবয় শুরু হয়। ন্যায় নীতি বিসর্জন দিয়ে মানুষগুলি সুযোগ সন্ধানী হয়ে ওঠে। এই নতুন পরিস্থিতি উদ্ভবের ফলে বাঙালির একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধন ক্রমশ শিথিল হতে থাকে।

মোটকথা, দাঙ্গা, দেশভাগ ও স্বাধীনতার জঠর থেকে এই চল্লিশের দশকেই বাংলার সমাজ কাঠামো স্বাধীনতা-পূর্বকালীন আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। মধ্যবিত্ত পরিবারের ভিত্তি ভেঙে যায়। চতুর্দিক কালোবাজারি আর চোরা কারবারিতে ভরে যায় আর তার সঙ্গে হাত মেলায় অসাধু ব্যক্তিরা। ইংরেজ চলে যাবার পর যেমন হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের সেতু ভেঙে যায়, তেমনি মানুষের মন থেকে বিশ্বাস ও সম্প্রীতির ধারণা বিলুপ্ত হতে থাকে। উপরন্তু, চল্লিশের দশকে ট্রেড ইউনিয়নগুলির দিশাহীন আন্দোলন ও মালিকপক্ষের চরম মুনাফাবাজ

নীতির ফলে বহু কলকারখানা লক-আউট ঘোষিত হয়। ফলে বহুসংখ্যক শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে। এছাড়া এই সময়ে ব্যাঙ্ক ফেল, মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীর কর্মচ্যুতি আরো বেশি বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। শুধু প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে তৎকালীন মধ্যবিত্ত মানুষগুলি কিংবা ওপার বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুরা সবরকমের মূল্যবোধ বিসর্জন দেয়। এইরকম উত্তাল সামাজিক অবস্থায় সমকালীন কথাসাহিত্যিকরা প্রায় নীরব থেকেছেন। আর যাঁরা এই সময়ের মধ্য দিয়ে বাল্য-কৈশোর অতিবাহিত করেছেন, তাঁদের মধ্য থেকেই যাঁরা পরবর্তীতে কথাসাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের বাল্য-কৈশোরের এইসব অভিজ্ঞতাকে মূলধন করেই বাংলা উপন্যাসকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছেন। ঔপন্যাসিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদেরই অন্যতম।

তিন.

চল্লিশের দশকের বিপর্যস্ত সময়ের শরিক বাঙালি লেখকবৃন্দ তাঁদের লেখায় বিষয়বস্তু পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেন। লেখকদের সেই অনুভব থেকে চল্লিশের দশকেই বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে পঞ্চাশের দশকের বিচিত্র প্রবণতার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। বিষয়বস্তুর এই পরিবর্তন খুব সহজে আসেনি, এর পশ্চাতে ছিল সমকালীন লেখকদের অন্তহীন প্রয়াস। ঔপন্যাসিকরা একরকম ছন্দহীন বা দিশাহীন অবস্থার মধ্য দিয়ে লেখার বিষয়বস্তু পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "বিমুখ বর্তমান ও বিশূন্য ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অধিকাংশ লেখকদের মনে এল এক পঙ্গু অসহায়তা বোধ। এরকম অবস্থায় জনজীবনের শুষ্ক খাতে আশার ধারা সঞ্চারিত করতে হলে অবশ্যই গোটা সমাজের দ্বান্দ্বিক চেহারার অনুধাবন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইতিহাসের কার্যকারণ পরম্পরার সে দ্বন্দ্বময় স্বরূপকে তখন সমাজ-জ্ঞানের মুখস্থ করা সূত্র দিয়ে উপলব্ধি করা যায়নি। অ্যাভারেজ বাঙালী পাঠক তখন নিজের জীবনকে ঘৃণা করে বলেই সাহিত্য-দর্পণেও নিজেকে প্রতিফলিত দেখতে আগ্রহী ছিল না। এই মানসিক শূন্যতা পূরণের জন্য লেখকদের বৃহৎ অংশে তখন প্রয়াসও ছিল অন্তহীন। তারই পরিণতিতে দেখা দিল বিষয়বস্তু পরিবর্তনের তাগিদ।" [১১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা, আগস্ট আন্দোলন, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার অভিঘাতে বাংলা ও বাঙালি জীবনের যে বিপর্যস্ত প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল, তাতেই বাংলা উপন্যাসের গতিপথ প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে যায়। কখনওবা স্খলিত ছন্দহীন পদক্ষেপে বাংলা উপন্যাস খানিকটা অগ্রসরও হয়। কিন্তু সেই পদক্ষেপ সুদৃঢ় হতে পারেনি। সেদিনের লেখকরা

31 MAY 2013
252136

বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক তরঙ্গাভিঘাতকে সাহিত্য দর্পণে সদর্থকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি। আসলে সময়ের অভিঘাতে সমগ্র সমাজ তখন প্রায় মুহ্যমান। তবুও এই পরিস্থিতিতেই লেখকরা পথ খুঁজে পাবার অক্লান্ত চেষ্টাও করেছেন। ফলত চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সমসাময়িক বিষয়গুলি (আগস্ট আন্দোলন, মন্বন্তর, দাঙ্গা ইত্যাদি) বাংলা উপন্যাসে স্থান পেতে থাকে, কিন্তু আবার তা চোরাবালিতে যেন হারিয়েও যায়। চল্লিশের দশকের জ্বলন্ত সমস্যা ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের সমস্যা, অথচ সেদিনের বাঙালি কথাসাহিত্যিকরা সেই বিষয়ে ভয়ঙ্কর নীরবতাই পালন করেছেন। বিদগ্ধ সমালোচক অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর 'ভাঙা বাংলা ও বাংলাসাহিত্য' গ্রন্থে এর বিস্তৃত অনুসন্ধান করেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন : "... সাম্প্রদায়িক হানাহানির, বিদ্বেষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ দেশত্যাগের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড়িয়ে লেখকেরা হয় নীরবতার আশ্রয় নিয়েছেন, অথবা যান্ত্রিকভাবে সদর্থকতা ও সম্প্রীতির সন্ধান করেছেন, লিখেছেন কিছু তত্ত্বের ছাঁচে ঢালা রচনা, এড়িয়ে গিয়েছেন অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্ন।" [১২]

বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের সময় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ লেখকেরা উপন্যাস রচনা করেছেন। যুদ্ধ পরবর্তীকালে সতীনাথ ভাদুড়ী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমকালীন গণ-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু সমসাময়িক জীবনের উত্তাল তরঙ্গকে বিষয়ীভূত করে উপন্যাস রচনার প্রয়াস এই সময়ে খুব বেশি অগ্রসর হয়নি। জাতীয় জীবনে ক্রমান্বয়ে নানা অভিঘাতে জনমানস তখন এতটাই বিভ্রান্ত যে, লেখকরা সমসাময়িক বিপর্যস্ত জীবনের পটভূমিকায় উপন্যাস রচনার স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেননি। তবে তিরিশের দশকে লেখকের লেখনীতে যে বলিষ্ঠ জীবন চেতনার পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম, সেই — বলিষ্ঠতা যে ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছিল — এই সময় সময় থেকে তা স্পষ্ট হতে শুরু করে। এই সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস নিঃসন্দেহে 'জাগরী' (১৯৪৫)। 'জাগরী' উপন্যাসের নীলু, বিলু, বাবা ও মায়ের পারিবারিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক মতপার্থক্যের সংঘাতে বিপর্যস্ত জীবন যেন ভবিষ্যতের ভারতবর্ষকে চিনিয়ে দিয়েছিল। পারিবারিক বন্ধন, নাকি রাজনৈতিক মতাদর্শ — এর মধ্যে কোনটি বড় আর কোনটি ছোট সেই দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত উপন্যাসের চারটি চরিত্র। রাজনীতির জন্য জীবন, না জীবনের জন্য রাজনীতি — এ-রকম মৌল প্রশ্নের মুখোমুখি উপন্যাসের চারটি চরিত্র — বাবা, মা, বিলু ও নীলু। যুদ্ধোত্তর কালের রাজনৈতিক দলগুলির নীতি আদর্শের দরকষাকষিতে

ভারতবর্ষ নামক এক বৃহৎ পরিবারে সেই সময় থেকেই নানা মত নানা পথের সূচনা হয়। 'জাগরী' উপন্যাসের মধ্যে আমরা বহুধাবিভক্ত সেই ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ পেয়ে যাই।

স্বাধীনতা উত্তরকালের আর্থসামাজিক পরিবর্তন ও রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে বাংলা উপন্যাসের কালান্তর অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তিরিশ ও চল্লিশের দশকের ঔপন্যাসিকদের বলিষ্ঠ আশাবাদ যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা-দেশভাগের বিপর্যয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে ঐ সময়কার বলিষ্ঠ ঔপন্যাসিকরাই বিষয়বস্তু পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেন। চল্লিশের দশকের গোড়ায় যে তারাশঙ্কর লেখেন 'গণদেবতা'র (১৯৪২) মতো উপন্যাস, তিনিই সমসাময়িক বিষয়কে নিয়ে লেখেন 'মন্বন্তর' (১৯৪৩)। আবার পঞ্চাশের দশকে তিনি পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন রাঢ় অঞ্চলকেন্দ্রিক আঞ্চলিক জীবন নির্ভর উপন্যাসের ক্ষেত্রে। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন 'চিহ্ন' (১৯৪৭)। এরপর পঞ্চাশের দশকে বাংলা উপন্যাসে ক্রমাগত বিষয়বস্তুর বিচিত্র সমাহার লক্ষ্য করা যায়। বাংলা উপন্যাসে বিচিত্র রূপসন্ধানী বিষয়বস্তুর সমাহার আসলে দেশের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের অনিবার্য পরিণাম। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, পঞ্চাশ-ষাটের দশকের বাংলা উপন্যাসে বিষয় বৈচিত্র্যের পূর্বাভাস চল্লিশের দশকের বাংলা উপন্যাসের মধ্যেই আভাসিত হতে থাকে। পঞ্চাশের দশক থেকেই বাংলা উপন্যাসে নতুন করে যুক্ত হয় — নতুন ধারার ঐতিহাসিক উপন্যাস, আঞ্চলিক জীবন-কেন্দ্রিক উপন্যাস, দাঙ্গা-দেশভাগ-উদ্বাস্তু সমস্যা-কেন্দ্রিক উপন্যাস, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন-কেন্দ্রিক উপন্যাস ইত্যাদি। ষাটের দশকে এইসব নতুন বিষয় বাংলা উপন্যাসে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

চার.

বাংলা উপন্যাসের বৈচিত্র্যময় প্রবণতা চল্লিশের দশকে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু-কেন্দ্রিক একটি সংক্ষিপ্ত ধারার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। সেই ধারায় 'জাগরী' (সতীনাথ ভাদুড়ী), 'ঝড় ও ঝরাপাতা' (তারাশঙ্কর), 'চিহ্ন' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) — এই জাতীয় উপন্যাস রচিত হয়েছিল। জাতীয় জীবনের দ্রুত পরিবর্তনশীলতার কারণে ঔপন্যাসিকদের পক্ষে বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল যে, আমরা তখন কোন অভিমুখে চলেছি। প্রকৃতপক্ষে দাঙ্গা ও দেশভাগ-বিধ্বস্ত বাঙালিরাই তো তখন সাংস্কৃতিক, আত্মিক এবং সর্বপ্রকার ভাঙনের মুখে বিপন্নতায় আক্রান্ত। এই অবস্থায় বলিষ্ঠ কথাসাহিত্যিকরাও যে বিপর্যয় কবলিত দেশকাল থেকে অপসৃত

হবেন এতে বিস্ময়ের কোনো অবকাশ নেই। সে কারণেই ঐ সময়ে নবাগত কথাসাহিত্যিকরাও যে ভিন্ন পথের সন্ধান করবেন এটাই স্বাভাবিক। এইজন্যই পঞ্চাশের দশকের বাংলা কথাসাহিত্যিকরা বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিচিত্র পথ সন্ধানী হয়ে ওঠেন।

এই সূত্রেই পঞ্চাশের দশকে নতুন করে ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি ধারার সূত্রপাত হয়। তবে বঙ্কিম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসের চেয়ে তা অনেকটাই পৃথক। উজ্জ্বল কুমার মজুমদার 'পঞ্চাশের দশকের কথাকার' নামক তাঁর প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন : "যে প্রবীণ কথা শিল্পীরা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন তাঁদের রচনায় বঙ্কিমী ঐতিহাসিক রোমান্সের গন্ধ থেকে গেলেও সামাজিক ইতিহাসকে তাঁরা অনেক বেশি পরিমাণে আনতে চেয়েছেন।" [১৩] প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী', 'লালকেল্লা', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গৌড়মল্লার', মহাশ্বেতা দেবীর 'নটী' প্রভৃতি নতুন ধারার ঐতিহাসিক উপন্যাসে রাজরাজড়ার কাহিনির সঙ্গে নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবনকথাও স্থান পেয়েছে। এই ধারায় প্রথম দিকে সমরেশ বসু ('উত্তরঙ্গ'), বিমল কর ('সাহেব বিবি গোলাম') প্রমুখ কথা সাহিত্যিকরা সামিল হয়েছিলেন।

পঞ্চাশের দশকের বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস অভিধায় আর একটি শাখা বর্ধিত হতে থাকে। একে শুধু সমসাময়িক বিপর্যস্ত জীবন থেকে পলায়নের প্রচেষ্টা বলা যায় না, সুদীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে প্রাপ্ত স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে অবহেলিত দেশজনতার প্রতি এ হল সমাজ দ্রষ্টা লেখকের প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে উপন্যাসের বিষয়বস্তু পরিবর্তনকে অন্যভাবে দেখেছেন। তাঁর মতে, লেখকদের এই প্রয়াসের পিছনে ছিল সমকালীন জীবনের শূন্যতা পূরণের প্রয়াস। এই প্রয়াসের এক মুখ ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং অন্য মুখ আঞ্চলিক জীবন সন্ধান। [১৪] 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (১৯৫১), 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৫২), 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬), 'গড় শ্রীখণ্ড' (১৯৫৭), 'পূর্বপার্বতী' (১৯৫৭), 'সিন্ধুপারের পাখি' (১৯৫৯) প্রভৃতি এই ধরনের আঞ্চলিক জীবন ভাবনার উপন্যাস।

ঐতিহাসিক এবং আঞ্চলিক উপন্যাস ছাড়াও সমসাময়িক জীবনকে উপজীব্য করে লিখিত উপন্যাসের সংখ্যাও কম নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা, জাতীয় আন্দোলন, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা ও উদ্বাস্তু সমস্যা, কলকাতার বুকে গণ-অভ্যুত্থান, ব্যাঙ্ক বিপর্যয় প্রভৃতি ঘটনাগুলি এক দশকেই বাঙালি জীবনে প্রবল ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করেছিল। ফলে স্বাধীনতা-

উত্তরকালে বাঙালি-জীবনের চিরাচরিত মূল্যবোধ, আদর্শ-বিশ্বাস সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। কলকাতার বহু বাঙালি বাবুর কৃষি নির্ভর জীবনের শিকড় ছিন্ন হয়ে যায়। কলকাতার বহু মধ্যবিত্ত মানুষ ব্যাঙ্ক বিপর্যয়ের ফলে হৃতসর্বস্ব হয়ে যায়। উপরন্তু দেশভাগের ফলে কলকাতা মহানগরী ও শহরতলীর অঞ্চলগুলি উদ্বাস্তু জনতার চাপে পর্যুদস্ত হয়ে ওঠে। কারখানাগুলিতে শ্রমিক-আন্দোলন ও লক-আউটের ফলে বহু শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা-উত্তরকালের এই পরিস্থিতিতে পেশার সন্ধানে পুরুষেরা যেমন ঘরছাড়া হতে বাধ্য হয়, নারীরাও তেমনি ঘরের বাইরে পেশার সন্ধানে যেতে বাধ্য হয়। পরিবারগুলির অর্থনৈতিক চিত্র বদল হতে থাকে। এর প্রভাব পড়ে পারিবারিক নীতি আদর্শ ও সম্পর্কের উপর। যৌথ পরিবারের বন্ধন এ কারণেই শিথিল হতে থাকে। পঞ্চাশের দশকের উপন্যাসে এই বিপর্যস্ত সময়ের চিত্র ধরা পড়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দূরভাষিণী' (১৯৫২), 'চেনামহল' (১৯৫৩), সমরেশ বসুর 'বি. টি. রোডের ধারে' (১৯৫২), সন্তোষ কুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি' (১৯৫০), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোন' (১৯৫৫) প্রভৃতি অনেকানেক উপন্যাসে।

পাঁচ.

পঞ্চাশের দশকের বাংলা উপন্যাসের বহু বিচিত্র গতির মধ্যে ঔপন্যাসিকদের একটি বিশেষ প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে — সেই প্রবণতাটি নিশ্চিতরূপে স্বাধীনতা-উত্তরকালের পরিস্থিতিতে বিশ্বাসের সংকটে বিপন্ন মানুষের জীবনসংগ্রাম ও অন্বেষণের প্রবণতা। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ঔপন্যাসিকরা নতুন করে শেকড় খোঁজার কাজ শুরু করেন। ধর্মের নামে ক্ষমতালোভীরা কিভাবে একটা দেশ এবং একাধিক জাতির সুদীর্ঘ সময়ের সহাবস্থানের ঐতিহ্যকে কুঠারাঘাত করতে পারে — জাতীয় জীবনে তারই উৎস অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয় পঞ্চাশের দশকের কথা সাহিত্যে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলিতে সেই শিকড়-সন্ধানের ব্যাপারটি নিরন্তর ক্রিয়াশীল। সেই প্রবণতাহেতু তাঁর বাল্য-কৈশোর এবং যৌবনের দিনগুলিকে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্বকালের সময় ধারার সঙ্গে তিনি অনায়াসে যুক্ত করেছেন। এভাবেই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকালের অখণ্ড ধারা প্রবাহের মধ্যে তাঁর সমকালের মানুষের জীবনসংগ্রাম ও জীবনান্বেষণের বিষয়কে যুক্ত করেছেন।

কথাসাহিত্যিক হিসেবে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক আবির্ভাব বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। কথাসাহিত্যে তাঁর প্রথম আবির্ভাব গল্পকার হিসেবে। তাঁর

সেই আবির্ভাবের ইতিহাস খানিকটা ভিন্ন রকমের। জীবন-জীবিকার সংগ্রামে বিপর্যস্ত অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় কতকটা আকস্মিকভাবেই বন্ধুদের অনুরোধে প্রথম গল্প লিখেছিলেন। বহরমপুর থেকে 'অবসর' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প 'কার্ডিফের রাজপথ'। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে তিনি কথাসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর এই প্রথম আবির্ভাবের কথা জানিয়েছেন : ''বন্ধুদের আগ্রহে প্রথম গল্প 'কার্ডিফের রাজপথ' লিখি। বহরমপুরের অবসর পত্রিকায় ১৯৫৬ সালে লেখাটি প্রকাশিত হয়। পরের বছর উত্তরকাল পত্রিকায় লিখি 'ফ্রেন্ডশিপ' — সেই বছরই প্রকাশিত হয় 'চিত্রকল্প'। সেই সময়ে বহরমপুরে শক্তিমান একটি লেখক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল এই পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে। আর ১৯৫৮ সালে প্রথম কলকাতার কাগজে ছাড়পত্র পাই — যুগান্তর সাময়িকীতে 'পোড়া কয়লা' নামে গল্পটি প্রকাশিত হয়।'' [১৫] জানা যায়, তিনি 'সমুদ্র মানুষ' (১৯৫৬) নামে প্রথম উপন্যাসটিও লিখেছিলেন বন্ধুদের আগ্রহে। লেখক জানাচ্ছেন : '' 'সমুদ্র মানুষ' লিখেছিলাম বন্ধুদের আগ্রহেই। 'উল্টোরথ' পত্রিকা 'মানিক স্মৃতি' পুরস্কার ঘোষণা করল। সেই সময় লিখি ওই উপন্যাস। দেবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, সাধন চৌধুরী, প্রশান্ত সেনগুপ্ত — আমার এই বন্ধুরা অনুরোধ করল — লেখ, লেখ। পাঠিয়ে দিলাম। ... আমার উপন্যাস 'সমুদ্র মানুষ' প্রতিযোগিতায় তৃতীয় হয়।'' [১৬] আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রথম গল্প ও প্রথম উপন্যাস — এ দুটি ক্ষেত্রেই তিনি অজানা দেশ অচেনা পটভূমির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আবার একইসঙ্গে উপরোক্ত দুটি রচনার ক্ষেত্রে শেকড়হীন মানুষের বেদনাবোধকে বিশিষ্টতা দান করেছেন। 'কার্ডিফের রাজপথ' বা 'সমুদ্র মানুষ'-এর মুখ্য চরিত্রগুলির বেদনাবোধ আসলে শেকড়হীন মানুষের বেদনাবোধ।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনি 'সমুদ্র মানুষ' লিখে থেমে থাকেননি। এরপর তিনি যে তিনটি উপন্যাস লিখেছিলেন সেগুলি হল — 'একটি জলের রেখা ও ওরা তিনজন', 'শেষ দৃশ্য', 'বিদেশিনী'। [১৭] কিন্তু লেখকের মনে তখন দানা বাঁধছিল দেশভাগের বিষয়। তিনি তখন সেই বিষয়ে বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন : ''দেশভাগ হতেই চলে এসেছি — ছিন্নমূল আমরা — এসব নিয়ে তখনও প্রায় কিছুই লিখিনি। আমার এইসব ভাবনাগুলো একে একে জড়ো হচ্ছিল — পর পর কতগুলো ছোটগল্প লিখে ফেললাম।'' [১৮] দেশভাগের বিষয় নিয়ে লেখা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ সময়ে (১৯৬৮) অনেকগুলি ছোটগল্প ও বড়গল্প লিখেছিলেন কবি মনীন্দ্র রায় সম্পাদিত 'অমৃত' পত্রিকায়। 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক তাঁকে ধারাবাহিক উপন্যাস লেখার অনুরোধ করলে তিনি সম্পাদককে শর্ত দিয়েছিলেন যে, তাঁর ইতিপূর্বে

প্রকাশিত গল্পগুলির আগে পুনর্মুদ্রণ করতে হবে, কেননা ঐ গল্পগুলি তিনি — ভাবী উপন্যাসের কথা মাথায় রেখেই লিখেছিলেন। পরে ঐ গল্পগুলিই 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের অঙ্গীভূত হয়। দেশভাগের বিষয় নিয়ে লেখা প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' ইতিপূর্বে 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার জন্য প্রথমে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসকে ছাড়পত্র দেওয়া না হলেও শেষ পর্যন্ত (১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে) 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ধারাবাহিক শুরু হয়। ১৯৭০-এ লেখা শেষ হয়। আমরা জানি, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। মূলত এই উপন্যাসই ঔপন্যাসিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক জীবনের একটি সুদৃঢ় স্তম্ভ। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসের কয়েকটি নামকরা উপন্যাসের একটি অবশ্যই 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। এখন লেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' প্রায় সমার্থক। মোটকথা, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পনেরো বছর সময়ের মধ্যেই বাংলা কথাসাহিত্যে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কেন লিখি' নামক গ্রন্থে লেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন : "আমি বার বার আমাকে নিয়েই লিখি। আমি ছাড়া যে আর কাউকে ভালো জানি না।" [১৯] লেখকের এই স্বীকারোক্তি তাঁর রচনা সম্পর্কে সর্বৈব সত্য না হলেও তাঁর জীবন মন্থনই যে সমস্ত ভালো উপন্যাসের উৎসভূমি সে সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের পরও তিনি এমন অনেক ভালো উপন্যাস লিখেছেন যেখানে তাঁর বাল্য-কৈশোর, দাঙ্গা-দেশভাগ-উদ্বাস্তু সমস্যার কথা এবং সেই জীবনের মর্মভেদী অভিজ্ঞতার কথা প্রাধান্য পেয়েছে। সেই অতীত স্মৃতি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে এভাবে ধারাবাহিকতা লাভ করেছে যে, আমরা লেখকের জীবন-উপলব্ধির মর্মকথাই অনুভব করি। তিনি তাঁর উপন্যাসে ঘুরে ফিরে যে জীবনের কথা বলেন — সেই জীবনের মূল কথাই হল — জীবন নিরন্তর সংগ্রামের নামান্তর। সেই সংগ্রামের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল থাকে মানুষের অনন্ত ইচ্ছার কথা। মানুষের জীবনে সেই অনন্ত ইচ্ছার মৃত্যু নেই, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার রূপান্তের ঘটে মাত্র। সেই ইচ্ছার তাড়নায় মানুষ জীবন খোঁজে। এরই নাম জীবনান্বেষণ। এই জীবনান্বেষণ মানুষের জীবনে শাশ্বত সত্যের মতো। সেই শাশ্বত অন্বেষণ প্রবণতার জন্য মানুষ নিরন্তর সংগ্রামী। হয়ত এজন্যই মানুষ মহাকালের প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিস্পর্ধী। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে কিছু সুনির্বাচিত উপন্যাস আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা সেই সত্য উদঘাটনে সচেষ্ট হব।

উল্লেখ সূচি

১) বিমল কর : 'আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা - ৯, আশ্বিন ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪।

২) অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : 'না লিখে পারি না'; সুভাষ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : 'কেন লিখি', মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৩৬।

৩) সুকুমার সেন : 'ভারত বিভাগ : স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস', ভাষা ও সাহিত্য, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৬।

৪) সুকুমার সেন : 'ভারত বিভাগ : ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ', ভাষা ও সাহিত্য, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৯।

৫) সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'দেশভাগ—দেশত্যাগ', অনুষ্টুপ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, বর্তমান সংস্করণ ২০০৭, পৃষ্ঠা ২২; লিওনার্ড মোশলে, 'দি লাস্ট ডেজ অফ্ দি বৃটিশ রাজ' পৃষ্ঠা ২২১।

৬) কমল চৌধুরী (সম্পাদিত) : 'বাংলায় গণ আন্দোলনের ছয় দশক', (১ম খণ্ড), পত্র ভারতী, প্রথম প্রকাশ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, বর্তমান সংস্করণ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৫৮।

৭) সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'দেশভাগ—দেশত্যাগ', অনুষ্টুপ, ১৯৯৪ খ্রি:, বর্তমান সংস্করণ ২০০৭, পৃষ্ঠা ১৮; জি. ডি. বিড়লা, 'ইনি দি শ্যাড়ো অফ দি মহাত্মা', পৃষ্ঠা ২৮৬।

৮) কমল চৌধুরী (সম্পাদিত) : 'বাংলায় গণ আন্দোলনের ছয় দশক', (১ম খণ্ড), পত্র ভারতী, ১ম প্রকাশ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, বর্তমান সংস্করণ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৯১।

৯) কমল চৌধুরী (সম্পাদিত) : 'বাংলায় গণ আন্দোলনের ছয় দশক', (১ম খণ্ড), পত্র ভারতী, ১ম প্রকাশ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, বর্তমান সংস্করণ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৯১-৯২।

১০) কমল চৌধুরী (সম্পাদিত) : 'বাংলায় গণ আন্দোলনের ছয় দশক', (১ম খণ্ড), পত্র ভারতী, ১ম প্রকাশ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, বর্তমান সংস্করণ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৯২।

১১) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ - ১৯৬১, বর্তমান সংস্করণ - পঞ্চম সংস্করণ - ২০০৩ পৃষ্ঠা ৩০৫।

১২) অশ্রুকুমার সিকদার : 'ভাঙা বাংলা ও বাংলাসাহিত্য', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ - ২০০৫, পৃষ্ঠা ২৫।

১৩) উজ্জ্বলকুমার মজুমদার : 'পঞ্চাশের দশকের কথাকার', (সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, 'সম্পাদকের কথা'।

১৪) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, ১ম প্রকাশ - ১৯৬১, বর্তমান সংস্করণ - পঞ্চম সংস্করণ ২০০৩, পৃষ্ঠা ৩০৫।

১৫) কল্যাণ মৈত্র : 'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এক অকথিত জীবন ও দর্শন নিয়ে আলাপচারিতায়', 'আমার সময়', ডিসেম্বর ২০০৯, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৫।

১৬) কল্যাণ মৈত্র : 'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এক অকথিত জীবন ও দর্শন নিয়ে আলাপচারিতায়', 'আমার সময়', ডিসেম্বর ২০০৯, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৫-১৬।

১৭) কল্যাণ মৈত্র : 'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এক অকথিত জীবন ও দর্শন নিয়ে আলাপচারিতায়', 'আমার সময়', ডিসেম্বর ২০০৯, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৪।

১৮) কল্যাণ মৈত্র : 'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এক অকথিত জীবন ও দর্শন নিয়ে আলাপচারিতায়', 'আমার সময়', ডিসেম্বর ২০০৯, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৪।

১৯) অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : 'না লিখে পারি না'; সুভাষ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : 'কেন লিখি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা ১৩৬।